৮ কন্যাশ্রী প্রকল্প

ভূমিকা—প্রকল্পের প্রেক্ষাপট—কন্যাশ্রী প্রকল্পের তাৎপর্য—কন্যাশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য—কন্যাশ্রী প্রকল্পের লক্ষ্য—কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুফল—উপসংহার।

❋ ভূমিকা : ভারতীয় সংস্কৃতিতে কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বিংশ শতকের বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির যুগেও সেই অবহেলা চলে আসছে। আজও আর্থসামাজিক কারণে কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা সমূলে বিনষ্ট হয়নি। আর তা হয়নি বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৩ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কন্যাসন্তানদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে, বাল্যবিবাহ রোধ করতে এবং কন্যাসন্তানদের বিদ্যালয়মুখী করতে, 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের যে অবতারণা করেছেন, তা সর্বস্তরে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে—হচ্ছে।

❋ প্রকল্পের প্রেক্ষাপট : মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"অর্থো হি কন্যা পরকীয়া এব"—অর্থাৎ কন্যাসন্তান মানেই পরের গচ্ছিত ধন। আর এই ধারণা থেকে কন্যাসন্তানদের অপরের হাতে সম্প্রদান করেই ক্ষান্ত হতেন কন্যার পিতা-মাতারা। এর ফলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন বারবার ব্যাহত হয়েছে।

কবি নজরুল তার 'নারী' কবিতায় লিখেছেন—

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"।

—অথচ আজও কন্যাসন্তানদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বিত না করে, তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির অপচয় ঘটিয়ে আসা হচ্ছে। এ কারণেই কবি নজরুল নারীসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, তারা যেন সমস্ত বাঁধন ভেঙে ফেলে চিরাচরিত প্রথার বাইরে বেরিয়ে এসে কর্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

❋ **কন্যাশ্রী প্রকল্পের তাৎপর্য :** 'কন্যাশ্রী' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'কন্যা' শব্দের অর্থ হল তনয়া, দুহিতা, মেয়ে ইত্যাদি। আর 'শ্রী' শব্দের অর্থ হল সুন্দর, লক্ষ্মী ইত্যাদি। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে কন্যারা হয়ে উঠবে সুন্দরী, বিদুষী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণা। তাই কন্যাসন্তানদের করে তুলতে হবে আত্মবিশ্বাসী, স্বনির্ভর ও দৃঢ়চেতা। আর এ কাজের জন্য দরকার উপযুক্ত প্রকল্প। আর কন্যাশ্রী প্রকল্প হল সেই প্রকল্প।

❋ **কন্যাশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** প্রকল্পটি বহুমুখী হলেও বর্তমানে মূলত এটি দ্বিমুখী—প্রথমত মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ করা আর দ্বিতীয়ত তাদের মেধার বিকাশের জন্য তাদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলা। শুধু তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে যে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে, তার গতি রোধ করা। সবার ওপর সমাজের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির জন্য মেয়েদের শামিল করতে হবে সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে—সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা করা অবশ্য কর্তব্য।

❋ **কন্যাশ্রী প্রকল্পের লক্ষ্য :** এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য দুটি লক্ষ্য সামনে রাখা হয়েছে—(এক) অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরতা ছাত্রীদের যাদের বয়স ১৩ থেকে ১৮-এর মধ্যে, তাদের বাৎসরিক ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। (দুই) যাদের বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে, তাদেরকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। বাৎসরিক ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়ার জন্য প্রতি বছরে ১৮ লক্ষ মেয়েকে এই প্রকল্পের শামিল করতে হবে। অন্যদিকে সাড়ে তিন লক্ষ ছাত্রীকে এককালীন অনুদান দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। তবে যারা এই সুবিধা ভোগ করবে, তাদের পিতা বা অভিভাবকদের আয় বছরে ১ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার বেশি হবে না এবং কন্যাসন্তানটিকে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রী হতে হবে।

❋ **কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুফল :** কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ, শিশুমৃত্যু ও অপুষ্টির পরিমাণ কমেছে। এছাড়া অল্প বয়সি মেয়েদের পাচার হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে উদ্ধার পেতেও এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্প বাল্যবিবাহের হারকে কমিয়ে দিতে পেরেছে।

রাজ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা কমেছে। এছাড়া কন্যাভ্রূণ হত্যা, কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা তথা পুত্রকন্যার বিভেদ সৃষ্টিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকটা কমেছে।

এ ছাড়াও আঠারো বছরের নীচে মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করা অনেকখানি সম্ভব হয়েছে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে।

❋ **উপসংহার :** ২০১৮ সালের ১৪ আগস্ট কন্যাশ্রী প্রকল্পের পাঁচবছর পূর্ণ হয়েছে এবং ওই দিনটি 'কন্যাশ্রী দিবস' হিসাবে পালিত হয়েছে। সারাবছরে প্রায় তিন লক্ষ আবেদনকারীকে অনুদান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও বাৎসরিক অনুদান দেওয়া হয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ আবেদনকারীকে। ফলে বেশ কিছু পরিবার যে উপকৃত হয়েছে—তা বলাই বাহুল্য। যাতায়াতের জন্য ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে চাহিদা অনুযায়ী সাইকেলের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ চিন্তায় পড়েছে—কাদের প্রথম দেওয়া হবে। তবে এই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে কন্যাসন্তানরা আগামী দিনে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে আশা করা যায়।

Scanned with CamScanner

৩৬ যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

ভূমিকা—মহাকাব্যিক যুদ্ধ —আধুনিককালের যুদ্ধের প্রকৃতি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার বিষময় ফল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তাঁর ফলাফল—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা—উপসংহার।

❋ **ভূমিকা** : পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুদ্ধ জিনিসটা মানুষের

Scanned with CamScanner

স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। আদিম যুগে মানুষকে পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করেই বাঁচতে হয়েছে। গাছের ডাল, পাথরের টুকরো ছিল তার সেদিনকার অস্ত্র। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Darwin-এর 'Survival of the Fittest' তত্ত্বটি এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে যোগ্য, তারই বাঁচার অধিকার আছে। আর এই যোগ্যতা প্রমাণের মাপকাঠি হচ্ছে যুদ্ধ : যুদ্ধের দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করে টিকে থাকাই জীবের তথা মানব সমাজের ধর্ম।

❋ **মহাকাব্যিক যুদ্ধ** : মহাকাব্যের যুগেও যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়—গ্রিক ঐতিহাসিক হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসিতে এবং বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাসের রামায়ণ ও মহাভারতে। ট্রয় সুন্দরী হেলেনকে নিয়ে যুদ্ধ তা পরবর্তীকালে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত হয়। রামায়ণের যুদ্ধ আর্য ও অনার্যের মধ্যে। তা অনেক সরল; কিন্তু মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ ও যুদ্ধ কৌশল অনেক জটিল।

❋ **আধুনিককালের যুদ্ধের প্রকৃতি** : আধুনিককালের যুদ্ধের প্রকৃতি প্রাচীনকালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধরীতি বড়ো। এখন বীরত্ব অপেক্ষা রণকৌশল যুদ্ধজয়ের পক্ষে একান্ত দরকার। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রই যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে দিয়েছে। দুই প্রধান শক্তির মধ্যে যুদ্ধ লাগলে পরে অন্য রাষ্ট্রগুলিও মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ হিসাবে জড়িয়ে পড়ে। এইরকম যুদ্ধের পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল—'War and Peace.'

❋ **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার বিষময় ফল** : ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিশ্বের সবকটি দেশই প্রায় এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যদিও ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয়নি—তবুও তাকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। পৃথিবীর যারা শান্তিকামী মানুষ—যাঁরা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, তাঁরা জাপান ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। বার্ট্রান্ড রাসেল, নাট্যকার বার্নার্ড শ, কবি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রঁমা রঁল্যা—সকলেই ধিক্কার জানান জার্মানি, জাপানের আগ্রাসন নীতিকে।

❋ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তাঁর ফলাফল** : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে 'লিগ অফ নেশনস্' এর প্রতিষ্ঠা হয়। জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করে তার ওপর বিরাট আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চোখে সে শত্রু বলে পরিগণিত হয়। ১৯৩৯ সালে জার্মানি সব কিছু অস্বীকার করে যুদ্ধ ঘোষণা করে। হিটলারের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন আর মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। সমগ্র বিশ্ব দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়—মিত্রশক্তি ও শত্রুশক্তি। মিত্রশক্তিতে যোগদান করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ। সমগ্র বিশ্বে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা সাধিত হল। আণবিক বোমার আঘাতে হিরোসিমা, নাগাসাকি ধ্বংস হয়ে গেল। বিশ্বে নেমে এল শোকের ছায়া। অর্থনৈতিক মন্দা সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করল—বেকারত্ব বাড়ল—খাদ্যাভাব দেখা দিল।

❋ **তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা** : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক কুড়ি বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি হয় তবে মহাকাশ বিজ্ঞান ও ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধের চেহারাই পাল্টে দেবে। সমগ্র বিশ্বে নেমে আসবে ধ্বংসের ঘনঘোর ছায়া।

Scanned with CamScanner

৬৫ খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা—শরীরচর্চা ও খেলাধুলা—বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা—চরিত্র গঠনে খেলাধুলা—শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে খেলাধুলা—খেলাধুলার সফল—উপসংহার। [ICSE–2005]

❋ **ভূমিকা ঃ** সভ্যতার ঊষা লগ্ন থেকেই খেলাধুলাকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে মানুষ বেছে নিয়েছে, খেলাধুলার আনন্দ মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি থেকে বৃহৎ কাজের জগতে মুক্তি দিয়েছে। জীবনে চলার পথে বলিষ্ঠ দেহ ও মনের প্রয়োজন খুব বেশি, সেই দেহ গঠনে উপযুক্ত উপায় হিসাবে শরীরচর্চা অর্থাৎ খেলা ধুলায় ভুমিকা যথেষ্ট পরিমাণ আছে, তাই আধুনিক যুগে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে খেলাধুলাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

❋ **শরীরচর্চা ও খেলাধুলা ঃ** সুস্থ জীবন ও শরীর ঠিক রাখার জন্য খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজন, যোগ ব্যায়াম, প্রাণায়ম প্রভৃতি মন সংযোগ বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। এই ব্যায়ামের অঙ্গ হিসাবে খেলাধুলার ভুমিকা উল্লেখযোগ্য, খেলাধুলায় শরীরের পেশিগুলি মজবুত হয়, দেহের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, সুস্থ জীবন লাভ করে।

❋ **বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ঃ** আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। খেলা দলগত দক্ষতায় ফুটবল, ক্রিকেট হকি ইত্যাদি খেলা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে দলগত খেলাগুলির মতো ব্যক্তিগত খেলাতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত খেলার মধ্যে লং জ্যাম্প, হাই জ্যাম্প, দৌড়, সাঁতার,

Scanned with CamScanner

ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলাগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সূত্রেই সৃষ্টি হয়েছে অলিম্পিক গেমসের মতো বিশাল ক্রীড়াযজ্ঞ।

❋ **চরিত্র গঠনে খেলাধুলা :** খেলাধুলা ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু শরীর গঠনই হয়না, চারিত্রিক গঠনও হয়। খেলার মাঠে পারস্পরিক সহযোগিতা, উদার মনোভাব, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণগুলি জাগ্রত হয়। অবসর বিনোদনে খেলাধুলার একটি বড় স্থান আছে, খেলায় অংশগ্রহণ করা খেলা দেখা বা খেলার বিবরনী শোনা সবই শিক্ষনিয় বিষয়, খেলার মাঠে গিয়ে অনুশীলন বা প্রতিযোগীতায় নিয়ম নীতি ও সময় সূচি মেনে চলতে হয়, সেই সময় অনুশীলন ছাত্র ছাত্রিকে শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

❋ **শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে খেলাধুলা :** ছাত্রজীবনে বিদ্যা অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষাকে পূর্ণতা এনে দেয় খেলাধুলা, খেলাধুলা ছাত্র জীবনে সজীবতা আনে, প্রাণের উদ্দিপনা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'Playing Football is better than reading the Gita' গীতাপাঠ অপেক্ষা খেলাধুলা ভালো, সুতরাং পড়াশুনার মাঝে খেলাধুলার প্রয়োজন যথেষ্ট শিক্ষাক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ ও তার ভিতকে মজবুত করার জন্য।

❋ **খেলাধুলার সফল :** খেলাধুলা শ্রম করার শক্তি স্বাভাবিক ঘুম, সুস্থদেহ, উদ্দীপনা খাদ্যের প্রতি রুচি ইত্যাদি তৈরি করে। এতে পেশী মজবুত করে এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। আধুনিক যুগ যান্ত্রিকতার যুগ, তাই যান্ত্রিকশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে খেলাধুলাই পারে প্রাণের সঞ্চার জাগাতে, এখনকার ছেলে-মেয়েরা ঘরে বসে কম্পিউটারে মোবাইলে গেম খেলে, মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করে না। এরফলে শারীরিক ও মানসিক গঠন দুর্বল হয়ে পড়ে।

❋ **উপসংহার :** খেলাধুলা হল গতির উৎস, জাতি গঠনে সুস্থ সবল দেহ ও মন গঠনে খেলাধুলাকে হাতিয়ার করে তুলতে হবে। খেলাধুলার দৈহিক সফলতা হয় চরিত্র গঠন নয়, আমাদের জীবিকার পথও হতে পারে, বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরগুলিতে খেলোয়াড়দের জন্য চাকরি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রি খেলাধুলায় অংশগ্রহনে চেষ্টা করেও রাজনৈতিক দলাদলির জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের খেলতে নেওয়া সম্ভব হয়না। এই সংকীর্নতাকে দুর করে খেলোয়ারদের খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের মনকে সতেজ করে তুলতে হবে।

❁ ❁ ❁

Scanned with CamScanner

৫৯ একটি শীতের সকাল

ভূমিকা—গ্রাম বাংলার শীতের সকাল —শীতের সকালের ভাবরূপ—শীতের সকালের রূপ বদল—উপসংহার।

ভূমিকা : "শীতের হাওয়ায় লাগল কাঁপন
আমলকির ওই ডালে ডালে"

—শীত আমাদের অভিপ্রেত ঋতু। তাতে নেই গরমের তাপ দহন—বরং আছে এমন একটা সুন্দর আমেজ যা অনির্বচনীয়। অন্ধকার শেষে কুয়াশায় মোড়া শীতের সকাল সত্যই অপূর্ব। পূর্ব দিগন্তে তরুণ তপনের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাখালিয়া বেশে শীতের সকাল আবির্ভূত। জেগে ওঠা পাখিদের কলকাকলিতে প্লাবিত চারদিক। এরপর কুশায়ার মোড়ক ভেদ করে সূর্যোকরোজ্জ্বল শীতের সকালের আবির্ভাব ঘটে।

গ্রাম বাংলার শীতের সকাল : শীত বড়োই আমেজের ঋতু। শীতের সকালে লেপের তলা থেকে উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছা করে না। গরম বিছানায় স্ব-রচিত উত্তাপ ছেড়ে কেমন যেন এক দুর্নিবার আলস্য পেয়ে বসে। তন্দ্রা বিজড়িত চেতনায় পাখিদের কলকূজন শোনা যায়। প্রকৃতির দিকে তাকালে এক সীমাহীন বিষণ্ণতা ও বৈরাগ্যের ছাপ চোখে পড়ে।

শীতের সকালের ভাবরূপ : ধীরে ধীরে পূর্ব দিগন্তে রং বদলায়। উত্তর দিক থেকে হিমের হাওয়া বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মতো গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। বনভূমিতে জাগে অদ্ভুত শিহরণ। গাছের পাতা কেঁপে ওঠে সহসা। পাতা থেকে টুপটাপ করে শিশির ঝরে পড়ে—শিশিরসিক্ত পথঘাট। ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দু সকালের আলোয় ঝলমল করে—কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়—

"শিশির কণায় মানিক ঘনায়
দূর্বাদলে দীপ জ্বলে।"

Scanned with CamScanner

—বাতাসে একটা অদ্ভুত লোভনীয় মিষ্ট গন্ধ—কাছে কোনো বেকারির পাউরুটি তৈরির গন্ধ ভেসে আসছে। সকালের পড়ুয়ার দল তৈরি হয়ে স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে তাদের অভিভাবকরা বাসের জন্য হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছে। বাজারের থলি হাতে ব্যস্ততার মধ্যে চলেছে, স্থানীয় মানুষজন। চারদিকে একটা ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। চায়ের টেবিলে গরম চা—সিদ্ধ ডিম আর কড়মড়ে টোস্ট প্রস্তুত। মুখে হাতে জল দিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে চায়ের টেবিলে বসে গরম চায়ে চুমুক যেন অমৃতের স্বাদ এনে দেয়। প্রাতঃরাশ সেরে রুটিন মাফিক পড়ার টেবিলে বসতে হয়—তবে দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার দিকে ৮টা বাজলেই স্নানের জন্য বাথরুমে। গিজারের গরম জলে বেশ করে স্নান সেরে জামাকাপড় পড়ে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত।

দৃষ্টি পড়ে কাছের কৃষ্ণচূড়া গাছে। কেমন একটা বৈধব্যের ভাব। গাছের ডালে বসে খঞ্জনার ডাক শুনতে পেলাম। একটা নীলকণ্ঠ পাখি বোধ হয় কোথাও উড়ে গেল। ফিঙে পাখি তার বিনুনি লেজ দুলিয়ে সামনের গাছটায় এসে বসল। কাঁচা রোদে সমস্ত কিছু যেন হাবুডুবু খাচ্ছে।

শীতের সকালের রূপ বদল : বেলা বাড়তে থাকে। গগনে সূর্যের উত্তরণ শীতের তীব্রতা কমায়। উত্তুরে বাতাসের তীব্রতাও কমে আসে। সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ বিলি করে দুধওয়ালা। ইস্ত্রিওয়ালা দরজায় ঘণ্টা বাজায়—ইস্ত্রির কাপড়ের জন্য। বাড়ির মধ্যে ব্যস্ততা। উঠতে দেরি হওয়ায় অফিসের ভাত ঠিক সময়ে রান্না হয় না। প্রেস্টিজ কুকারে চাপিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নার কাজ সমাধা করতে হয়। ঘড়িতে ৯-৩০ মি. বাজে। অফিসের ব্যাগ হাতে মানুষ ছোটে মেট্রো স্টেশনের দিকে। কারণ বাসে-ট্রামে গেলে নির্ঘাৎ লেট হবে। রাস্তাঘাটে দারুণ ব্যস্ততা। দোকানে দোকানে ভিড় বাড়ে। দু-চারজন বৃদ্ধ তখন পার্কের বেঞ্চিতে বসে পরচর্চা বা ঘরচর্চা করে সময় কাটায়। বাজারের থলিতে ফুলকপি, বাধাকপি, গাজর, কড়াইশুঁটি, বেগুনের উঁকিঝুঁকি। শীতের সকাল এক অনবদ্য ছবি।

উপসংহার : গ্রামের মাঠে-ঘাটে শীতের সকাল শহরের থেকে আলাদা। সেখানে শীতের সকাল যতখানি অনুভবগম্য শহরে ততখানি নয়। গ্রামের কুশায়ায় যে জৌলুস আছে, শহরের শীতের কুয়াশায় সে জৌলুস নেই। তবে কুয়াশার অন্ধকার চিরে যখন ভোরের ট্রাম বা বাস আত্মপ্রকাশ করে তখন ভারি ভালো লাগে। শীতকে যে যাই বলুক—শীত কিন্তু ঋতুশ্রেষ্ঠ। বসন্ত তার রূপসৌন্দর্য নিয়ে আসে সত্য—মনোমুগ্ধকর রূপে ভোলায় সকলকে, কিন্তু শীতের সকালের যে সৌন্দর্য তার তুলনা নেই।

Scanned with CamScanner